শির্ক কী ও কেন?

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী

বাংলাদেশে শির্ক চর্চার কেন্দ্রসমূহ

শির্কের কেন্দ্রসমূহ :

আমাদের দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় শির্ক চর্চা করার যে সব কেন্দ্র রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে দেখা যায় যে, সংখ্যার দিক থেকে যেমনি তা অগণিত, প্রকারের দিক থেকেও তেমনি তা বিভিন্ন রকমের। চিন্তা করলে এগুলোকে মোট আট প্রকারে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম প্রকার : এমন সব কেন্দ্র যা ওলীদের কবরকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে

এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুগে যুগে অসংখ্য আউলিয়া ও সৎ ব্যক্তিবর্গের শুভাগমন হয়েছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে তাওহীদের সন্ধান দান করা এবং তাদেরকে সকল সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসে পরিণত করা। এ চেষ্টা ও সাধনা করতে করতে তাঁদের অনেকে এ- দেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন শাহ জালাল, [1] শাহ পরান, [2] শেখ বদর[3] ও আল্লামা কেরামত আলী জৌনপুরীসহ[4] আরো অগণিত মনীষীগণ।

বহুকাল অতিবাহিত হয়ে যায় তাঁদের কারো সমাধি বা বিশ্রাম স্থলের উপর কোনো প্রকার স্থাপনা ও গম্বুজ নির্মাণ করা হয় নি। কবরের উপর টানানো হয় নি কোনো পর্দা। ছিল না এর কোনো খাদেম; কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে শুরু হয়ে যায় তাঁদের ভক্তদের সাথে শয়তানের প্রাচীনতম খেলা। কাওমে নূহ এর মত তাদের অন্তরেও সে এ ধারণার জন্ম দিল যে, এ সব ওলিগণ হলেন আমাদের ও আল্লাহর মধ্যকার মাধ্যম, তাঁরা হলেন আল্লাহর নিকট আমাদের যাবতীয় অভাব ও অভিযোগ উপস্থাপনের ব্যাপারে শাফা‘আতকারী। আল্লাহর সন্তুষ্টি তাঁদের সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত, তাঁরা মরে গেলেও রূহানী শক্তি বলে তাঁরা আমাদের দুনিয়া-আখেরাতের অনেক কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূর করতে পারেন।

এভাবে যারা এখানে এসেছিলেন শির্ক নিপাত করে ইসলামের তাওহীদী পতাকা উড্ডীন করতে, কালের পরিক্রমায় শয়তানের প্ররোচনায় তাঁদের কবর ও বিশ্রামের স্থানসমূহই ইসলামকে ধ্বংস করার ও শির্ককে প্রসারিত করার অসংখ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁরা যেখানে জনগণকে শির্কের অপরাধে জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন, সেখানে তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই শয়তান এমন সব ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করে দিলো, যার মাধ্যমে সে জনগণকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করে ফেললো। তাদেরকে কীট-পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাপ দিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিল।

উল্লেখ্য যে, ওলীদের কবর কেন্দ্রিক শির্কের কেন্দ্রসমূহ শির্কের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহের তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও এগুলোর অপকারিতা ও অনিষ্টতা অন্যান্যগুলোর চেয়ে অধিক; কারণ, এ সব কেন্দ্রের মধ্যে এমনও কেন্দ্র রয়েছে যা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং তা তাদের দুনিয়া-আখেরাতের মুক্তি!

অর্জনের সহজ ও সরল মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর :

এক্ষেত্রে শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যার ফলে সেখানে দৈনন্দিন দেশের দূর-দূরান্ত থেকে শত শত লোক তাদের মনোবাঞ্ছনা পূরণের উদ্দেশ্যে আগমন করে। আমার এ গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ উপলক্ষে আমি ১৯৯৯ সালে সেখানে গিয়েছিলাম। আগত ব্যাক্তিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তার পরিচয় জানতে চাইলে লোকটি বললো : সে কুমিল্লা জেলা থেকে তার একটি মানত পূরণের উদ্দেশ্যে সপরিবারে এখানে আগমন করেছে। অনেককে দেখলাম কবরের খাদিমের নিকট টাকা, মোমবাতি ও আগরবাতি দিচ্ছে। কেউবা কবরের গিলাফের উপর গোলাপজল ছিটাচ্ছে। আরেকজনকে দেখলাম কবরের উত্তর পূর্ব পার্শ্বে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আগরবাতি জ্বালাচ্ছে।

এ সবই অবলীলায় করা হচ্ছে সকলের মানত পূর্ণ করার নিমিত্তে। অনুরূপভাবে আরো দেখলাম কিছু লোক কবরের চার পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে রয়েছে। আবার অনেকে কবরের পশ্চিম উত্তর পার্শ্বের নির্ধারিত স্থানে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছে। আবার পুকুরে গিয়ে দেখলাম কেউ কেউ পুকুরের মাছগুলোকে ছোট ছোট মাছ খেতে দিচ্ছে। অনেকে কবরের বড় বড় ডেগ ও কূপে টাকা দান করছে। কূপ থেকে অপরিষ্কার ময়লা পানি নিয়ে পান করছে। এক ব্যক্তি এ ময়লা পানি বোতলে ভরে বিক্রি করছে। এ সবই করা হচ্ছে কবরবাসী শাহ জালাল (রহ.) এর নিকট এ আকুতি প্রকাশ করতে- তিনি যেন তাদের ইহকালীন কল্যাণ এনে দেন এবং অকল্যাণ দূর করে দেন।

অথবা তিনি যেন আল্লাহর নিকট সে জন্য শাফা‘আত করেন। আর সে জন্যই তারা কবরের পার্শ্বে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে ও বিগলিত চিত্তে নেহায়েত অনুনয়-বিনয়ের সাথে দো‘আ করছে। তাদের ভাবটা যেন এমন যে, তারা যেন বিপদে পড়ে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থী হয়ে হাত তুলেছে, তিনি ছাড়া যেন তাদের আর কোনো আশ্রয় স্থল নেই। তিনি ছাড়া তাদের উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ারও কোনো উপায় নেই। পৃথিবীর চলমান ঘটনা প্রবাহে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে জনমনে এ বিশ্বাসও রয়েছে যে, যে মাটিতে শাহ জালালের কবর রয়েছে সে মাটির নিকটে বা দূরে কোথাও কোনো মারাত্মক অঘটন ঘটতে পারে না। সে কারণেই একটি বিমান দুর্ঘটনায় কোনো হতাহত না হওয়ার ফলে পত্রিকান্তরে এ মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, সিলেটের মাটিতে শাহ জালাল (রহ.) শায়িত রয়েছেন বলেই বিমানের আরোহীরা নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল।[5] উক্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে বা তাঁর রূহানী নেক নজর লাভের আশায় কেউ কেউ জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কবর যিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারাভিযান আরম্ভ করতেও দেখা যায়।

শরফুদ্দীন চিশ্তী (রহ.)-এর কবর :

এ জাতীয় কেন্দ্রসমূহের মধ্যে অপর উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হচ্ছে রাজধানী ঢাকার হাইকোর্টে অবস্থিত শাহ শরফুদ্দিন চিশতী বেহেশ্তী (রহ.)-এর কবর। এ কবরটি বর্তমানের ন্যায় অতীতে এতো প্রসিদ্ধ ছিল না। রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত কবর ও কবরসমূহের উপর উর্দূ ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থে এ কবর সম্পর্কে লেখক যা বলেছেন, পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে সংক্ষেপে এর কিছু কথা অনুবাদ করে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

“অতীতে এ কবরের কিছু অনুসারী ছিল, যারা এ কবর যিয়ারত করতে আসতো। এ কবরবাসী সম্পর্কে সঠিকভাবে আমার কিছুই জানা নেই। আমার ধারণামতে এ কবরবাসী ব্যক্তি নওয়াব আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁন

চিশ্তীর কোনো নিকটাত্মীয় বা তাঁর কোনো সাথী হয়ে থাকবেন। এ কবরটি সরকারী জমির মধ্যে অবস্থিত হওয়ার কারণে বৃটিশ সরকার এ কবরটি নিশ্চিহ্ন করার জন্যে বারংবার চেষ্টা করেছে এবং এ উদ্দেশ্যে এর আশে-পাশে গাছও লাগিয়েছে। এর ভক্তদের দ্বারা কবরের উপর নতুন করে কোনো স্থাপনা বা গম্বুজ ইত্যাদি নির্মাণ করতেও বারণ করেছে, যাতে কবরকে ঘিরে পুরাতন যে দেওয়াল বা গম্বুজ রয়েছে তা সূর্যের আলোর অভাবে শেওলা ধরার ফলে ধীরে ধীরে নিজ থেকেই ধসে পড়ে।’’[6]

বৃটিশ শাসনামলের শেষ সময়ে এ কবরের এ জীর্ণ অবস্থা ছিল। তবে স্বাধীনতা উত্তরকালে এ কবরটি তার ভক্তদের দ্বারা পুরো মাত্রায় লালিত হতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে এর প্রসিদ্ধিও দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বর্তমানে প্রসিদ্ধির ক্ষেত্রে এটি প্রায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এক সময় এখানে ছিল না কোনো মসজিদ। কোনো কবরকে বা কবরকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করা শরী‘আতে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে এ কবরের ভক্তদের দ্বারা এ কবরকে ঘিরেই মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে শবে বরাতের রাতে এ কবর দর্শন করতে গিয়ে দেখেছিলাম, হাজার হাজার বনী আদম এ কবরের চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করছে। এ অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছিল- তারা যেন কা‘বা শরীফের চার পার্শ্ব দিয়ে প্রদক্ষিণ করছে। সে সময়ে এ কবরটির পরিবেশ বর্তমানের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ ছিল।

তখন কবরে অনেককে সেজদায় পড়ে থাকতে দেখা যেতো। কবরসহ পুরা এলাকাটি তখন মাথায় জটধারী নেংটা ফকীর, আউল-বাউল, মদ ও গাঁজাখোরদের আস্তানা ছিল। বর্তমানে এ কবরের অবস্থা অনেকটা উন্নতি লাভ করেছে। ১৯৯৯ সালে এ কবরটি পুনরায় দেখতে গেলে আমি আগের সেই অবস্থা দেখতে পাই নি। তবে এ কবরের উদ্দেশ্যে মানত করার এবং এখানে তা পূর্ণ করার সাধারণ মানুষের চিরাচরিত যে রীতি ছিল, বর্তমানেও তা পুরোমাত্রায় বহাল রয়েছে বলে দেখতে পেলাম। আরো দেখতে পেলাম একদল মানুষ কবরকে ঘিরে রয়েছে। এদের কেউবা বসে কিছু ধ্যান করছে, কেউবা দাঁড়িয়ে কিছু পাঠ করছে, আরেক দল মানুষ উচ্চ স্বরে মিলাদ পাঠ করছে। কিছু লোককে দেখলাম কা‘বা শরীফের ন্যায় এ কবরের বেষ্টনী ও দরজার চৌকাঠের উপর হাত মুছে নিয়ে নিজ মুখ ও শরীরে হাত বুলিয়ে বরকত হাসিল করছে।

কবর থেকে বের হওয়ার সময় বেআদবী হলে অনিষ্টের ভয়ে পিট পিছনে রেখে বের হচ্ছে। আরো দেখলাম কবর থেকে দূরে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে মোমবাতি জ্বালানো রয়েছে। একটি যুবককে দেখলাম কা‘বা শরীফের গিলাফ ধরে চুম্বন করে বরকত অর্জন করার ন্যায় মসজিদের উত্তর পার্শ্বের দেওয়ালে লাগানো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ‘আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.)-এর কবরের গিলাফদ্বয়ে ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করছে এবং গাল দিয়ে তা স্পর্শ করে তাথেকে বরকত গ্রহণ করছে।

উপর্যুক্ত এ জাতীয় শির্কী ও বেদ‘আতী কর্মে যে শুধুমাত্র আমাদের দেশের সাধারণ মুসলিমরাই জড়িত রয়েছে, তা নয়, বরং এ জাতীয় গর্হিত কর্মে সকল মুসলিম দেশের সাধারণ মুসলিমরাও জড়িত রয়েছে। এ জন্য মুসলিমদের এ জাতীয় কর্মের উপর আক্ষেপ করে আল্লামা আহমদ বাহজাত বলেন :

‘‘এ নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত না হওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মে অনেক দলীল প্রমাণাদি দাঁড় করানো সত্ত্বেও মুসলিমরা ওলীদের কবরে মসজিদ বানিয়েছে, তাঁদের সমাধিকে দৃঢ় ও মজবুত করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেছে, এমনকি এমন সব নামের উপরেও সমাধি তৈরী করেছে যে নামে আসলে কোনো ব্যাক্তিরও অস্তিত্ব নেই। বরং তা তৈরী করা হয়েছে কাঠের তখতী ও জীব জন্তুর লাশের উপর। এ অবস্থা সত্ত্বেও এগুলো জনগণের দ্বারা আবাদকৃত এমন সব কবর, যা বিপদ দূরীকরণ, রোগমুক্তি ও কঠিনকে সহজতর করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে (আগমনের

জন্য) উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে।’’[7]

আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর কবর :

এ দিকে চট্রগ্রামের আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর[৪] কবরও প্রসিদ্ধির দিক থেকে পিছিয়ে নেই। সেখানে বার্ষিক ওরসে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই আপন আপন প্রয়োজন পূরণার্থে একত্রিত হয়ে থাকে। ভক্তরা তাঁর প্রশংসায় কবিতার পুস্তক পর্যন্ত রচনা করেছে। এ কবরের ভক্ত এক হিন্দু কবি তার পুস্তকে নিজ গুরুকে স্বয়ং আল্লাহর অবতার বলে দাবী করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত কথা আমরা ইন-শাআল্লাহ শির্কের বাস্তব প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

এভাবে জনগণ প্রত্যেক ছোট ও বড় ওলিদের কবরগুলোকে পবিত্র স্থানে পরিণত করে হিন্দুদের ‘বৃন্দাবন’ ও ‘কাসী’র ন্যায় তীর্থযাত্রার স্থানে পরিণত করেছে। সেগুলোকে বিপদের সময় আশ্রয় নেবার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। যাবতীয় অসুখ-বিসুখ দূরীকরণ ও প্রয়োজন পূরণার্থে তারা সেখানে এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করে যেমন আরবের মুশরিকরা তাদের দেবতাদের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করতো। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নিশীথ রাতে নিজ গৃহে বসে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও অনুনয় বিনয় করার পরিবর্তে তারা এ সব ওলিদের কবরে এসে কান্নাকাটি ও অনুনয় বিনয় করে। উদ্দেশ্য তাঁরা যেন তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন এবং তাদের আকুতি ও মিনতির কথা স্মরণ করে আখেরাতের ভয়াবহ দুর্দিনে যেন তাঁরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা‘আত করেন।

কবরের খাদিম হওয়ার উদ্দেশ্য :

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ‘হিরনাল’-এর কথিত শাহ আলম আল-হাদী এর কবরের খাদেমকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম- আপনি এ কবরের খাদেম হলেন কেন? লোকটি উত্তরে বললো :

‘‘এ কবরের খাদেম হয়েছি এ আশা নিয়ে যে, আমার এ খেদমত দেখে কবরস্থ ওলি আমার উপর দয়াবান হবেন এবং তাঁর কবরের খাদেমী করার কথা স্মরণ করে আখেরাতে আমাকে সাথে না নিয়ে জান্নাতে যেতে লজ্জাবোধ করবেন।’’

ওলিদের কবরের ভক্তদের সেখানে যেয়ে মিনতি করার পার্থিব উদ্দেশ্য হয়তো বিভিন্ন রকমের হতে পারে; কিন্তু তাদের সকলের পরকালীন উদ্দেশ্য একটাই যা উক্ত শাহ আলম আল-হাদীর কবরের খাদেমের বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। অথচ তারা জানে না যে, ভাগ্য নির্ধারণের মালিক যেমন এককভাবে আল্লাহ, তেমনি তা পরিবর্তনের মালিকও এককভাবে তিনিই। শরী‘আত নির্দেশিত কর্ম করার মাধ্যমেই তা পরিবর্তনের জন্য তাঁর নিকট মিনতি করতে হবে। ভাল-মন্দ সকল মানুষের মিনতি শুনার জন্যে তো তাঁর দরজা সকলের জন্য সমানভাবেই উন্মুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর যে সকল সাহাবীদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে কেবল তাঁরা ব্যতীত পরবর্তী সৎ মানুষদের ব্যাপারে জান্নাতে যাওয়ার সুধারণা পোষণ করা গেলেও তা কারো জন্যে নিশ্চিত করে বলার অধিকার আমাদের নেই।

আর সে ধারণার ভিত্তিতে কোনো ওলি ও দরবেশের শাফা‘আত লাভের আশায় থাকারও কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা; তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জান্নাতী কি না, তা আমরা জানি না। জান্নাতী হয়ে থাকলেও শাফা‘আত করার বিষয়টি তাঁদের মালিকানাধীন বিষয় নয় যে, তাঁরা যাকে যখন খুশী শাফা‘আত করবেন। বরং তা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। কাকে কখন এর অনুমতি দেয়া হবে এবং কার জন্য হবে, তা কেবল তিনিই জানেন। তবে যারা আল্লাহর উলূহিয়্যাত বা রুবূবিয়্যাতে কোনো শির্ক করে মৃত্যুবরণ করবে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনামতে

তাদের কারো শাফা'আত প্রাপ্তির কোনই সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার : এমন সব কেন্দ্রসমূহ যা কোনো ওলির নিদর্শনের উপর নির্মিত হয়েছে :

এটি হচ্ছে এ দেশের সাধারণ মুসলিমদের সাথে শয়তানের তামাশা করার অপর একটি চিত্র। সে তাদেরকে ওলীদের কোনো কোনো নিদর্শনাদির উপর বা তাঁদের স্মৃতির সাথে জড়িত স্থানের উপর কোনো কবর ছাড়াই মাযার তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর সিলেট শহরে থাকা সত্বেও তাঁর নামে কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী উপজেলার গাজীপুর গ্রামে একটি এবং একই জেলার সদর উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে অপর একটি কবর রয়েছে।

এ দু'টি কবর সম্পর্কে উক্ত এলাকায় এমন জনশ্রুতি রয়েছে যে, শাহ জালাল (রহ.) তাঁর কোনো এক সফরে এ দু'টি স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন এবং সে দু'টি স্থানে তাঁর হাত ও পায়ের নখ, গোঁফ ও দাড়ি ছেঁটে এখানে দাফন করেছিলেন। পরবর্তীতে এ স্থান দু'টি জনগণের কাছে সম্মানিত স্থানে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে তা তাঁর কবরের সমান মর্যাদা পেতে থাকে। তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে সাধারণ লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে যা করে, এ দু'টি স্থানকে কেন্দ্র করেও এলাকার লোকেরাও তা-ই করে।[৭]

তৃতীয় প্রকার : পাগলদেরকে কেন্দ্র করে নির্মিত কেন্দ্রসমূহ :

যে সকল পাগল উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ থাকে, সাধরণত মানুষের সাথে কথা-বার্তা বলে না; বিভিন্ন কবর, গোরস্থান, জংগল ও বড় বড় বট গাছের তলায় রাত যাপন করে, রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ করে কারো নিকট কিছু চায় বা কাউকে কোনো বস্তু দান করে; এ জাতীয় পাগলদের প্রতি সাধারণ লোকেরা ভিন্নরকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকেন। এদেরকে অনেকেই আল্লাহর ওলি হিসেবে মনে করে থাকেন। এ জাতীয় পাগলদের মধ্যে কেউবা সত্যিকার অর্থেই পাগল হয়ে থাকে, আবার কেউবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করে পাগলের ভাব প্রকাশ করে থাকে। উদ্দেশ্য এ অবস্থাকে পুঁজি করে পরবর্তীতে জীবিকার্জনের একটি সহজ উপায় বের করা। তাই কিছু দিন এভাবে থাকার পর এরা উপযুক্ত স্থান দেখে নিজের জন্য একটি আস্তানা গড়ে তুলে এবং সেখানে বসেই সে সাধারণ মানুষের কল্যাণার্জনে ও অকল্যাণ দূরীকরণে নানারকম কবিরাজী, তেলপড়া, পানিপড়া ও তাবীজ-কবজ দিতে আরম্ভ করে। আমার জীবনে এ জাতীয় কিছু পাগলের সাথে দেখা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৮২/১৯৮৩ সালে ঢাকার গুলিস্তানে বর্তমান গাবতলী ও মিরপুরগামী বি. আর. টি. সি. বাস ষ্টেন্ডের স্থানে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ধ্যানে মগ্ন গলা ও গায়ে লোহার জিঞ্জিরের সাথে বড় বড় তালা ঝুলানো এক পাগল দেখেছিলাম। ১৯৮৫/১৯৮৬ সালে পুনরায় সে পাগলকেই ঠিক সেভাবেই সে স্থানে বসে তা'বীজ বিক্রি করতে দেখলাম। সাধারণ লোকেরা তাকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ তাবীজ নিতে চাইলে সে চোখ বন্ধ করে তার নিকটে রাখা একটি কাপড়ের ব্যাগ থেকে একটি তা'বীজ বের করে দিচ্ছে এবং বিনিময়ে দু'টি করে টাকা নিচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম অনেকেই তার নিকট থেকে তা'বীজ নিচ্ছে।

সাধারণ লোকদের মনে এ ধরনের পাগলদের ব্যাপারে ওলি হওয়ার ধারণা রয়েছে বলেই তারা এ পাগলের নিকট থেকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাবীজ নিচ্ছে। তারা এদের সাথে সুন্দর আচরণ করে, এদের সাথে বেআদবী করলে বিপদ হতে পারে বলে মনে করে, এরা কারো নিকট টাকা চাইলে তা সে ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করে দ্রুত তা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, না দিলে সমূহ ক্ষতিরও আশঙ্কা করে। কোনো ব্যবসায়ীর নিকট টাকা চাইলে ব্যবসায়ে অধিক লাভের আশায় সে তাকে তা দ্রুত দান করে। এদের দিলে ব্যবসায়ে লাভ হয় ও অধিক

বিক্রি হয়, আর না দিলে অন্যান্য দিনের তুলনায় এ দিনে বিক্রি কম হয়, এ মর্মে কিছু বাস্তব ঘটনার কথাও লোক মুখে শুনা যায়।

এ জাতীয় ঘটনা যদি সত্যিও হয় তবে এর অর্থ এ নয় যে, তা এ পাগলকে টাকা দেয়া বা না দেয়ার কারণে হয়েছে, বরং তা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছার কারণেই। তিনি এ জাতীয় পাগলের দ্বারা জনগণের ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে চান। তিনি দেখতে চান কার ঈমান মজবুত আর কার ঈমান দুর্বল। এদের কোনো কোনো কথার সত্যতা বাস্তবে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তা দেখে সাধারণ লোকেরা তাদেরকে ওলি বলে মনে করে এবং তাদের সত্য কথাকে তাদের কারামত হিসেবে গণ্য করে; অথচ তারা জানে না যে, এ জাতীয় পাগলেরা জঙ্গল ও গোরস্থানে থাকার কারণে এদের সাথে তাদের অজান্তেই শয়তান জিনের সখ্যতা গড়ে উঠে।

আর এ জিনরাই সাধারণ লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এদের মুখে কিছু সত্য কথা বা কোনো তথ্য বলে দেয়। শয়তান এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বনী আদমকে যুগের পর যুগ বিভ্রান্ত করে আসছে। সাধারণ লোকেরা এভাবে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়েই যুগে যুগে শির্কে লিপ্ত হয়েছে। যারা মিছেমিছি ওলি হওয়ার ভান করে সাধারণ মানুষদেরকে প্রতারণা করে তাদের সম্পদ ও ঈমান হনন করতে চায়, এদের সাথে যে শয়তানের সখ্যতা গড়ে উঠে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ٢٢١ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ٢٢٢ يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ ٢٢٣ ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٣]

“বল, আমি তোমাদেরকে বলবো কি কাদের উপর শয়তান অবতরণ করে? শয়তান অবতরণ করে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী গোনাহগারের উপর। তারা (ফেরেশ্তাদের নিকট থেকে) শ্রুত কথা তাদের নিকট এনে দেয়। এদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।”[10]

ফুটনোট

[1]. তিনি হলেন শাহ জালাল মুজাররাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম আল-ইয়ামানী অথবা আল-কুনইয়াবী। তিনি ৫৯৬/৫৯৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬২৫/৬২৬ হিজরীতে তিনি দিল্লী হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলায় সেকান্দর গাজীর সাথে তার একজন যোদ্ধা অথবা তার একজন সহযোগী হিসেবে আগমন করেন। তখন সিলেট এলাকায় হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের শাসন ছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হাতে কতিপয় কারামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, যা তাঁকে সিলেট এলাকা সহজে জয় করতে সাহায্য করেছিল। বিজয়ের পর তিনি সিলেটেই থেকে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। সিলেটে আগমনের প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ৩৬০ জন শিষ্য। তিনি ৭৪৭ হিজরীতে ১৫০ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। দেখুন : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ; (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ.৩৭৬; চৌধুরী দেওয়ান আনোয়ার, প্রাগুক্ত; শাহ জালাল (রহ.); ৩য় সংস্করণ, ই. ফা. বা., ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১১ ও ৪২; গোলাম সাকালায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩০।

[2]. শাহ পরান ছিলেন শাহ জালাল (রহ.)-এর ভাগ্নে এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাঁকে তিনি সিলেট শহরের উত্তর পূর্ব এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সিলেট শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর তাঁর সমাধি রয়েছে। দেখুন : চৌধুরী দেওয়ান আনোয়ার, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮০-২৮১।

[3]. শেখ বদর ছিলেন চট্রগ্রাম জেলায় আগত আউলিয়াদের মধ্যে অন্যতম। সাধারণ মানুষের মাঝে তিনি শেখ বদর ও বদর শাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় নি। সম্ভবত তাঁর নাম ছিল 'শাহ বদর উদ্দিন বদরে আলম'। কথিত আছে যে, তিনি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় শত বছর পূর্বে একটি বড় পাথরের উপর সওয়ার হয়ে সমুদ্র পথে চট্রগ্রামে আগমন করেন। সে সময় উক্ত এলাকায় জিনের মারাত্মক ধরনের প্রভাব ছিল। তারা মানুষদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিত। শেখ বদর সে এলাকায় আগমন করে মাটিতে একটি বাতি রাখার জন্য জিনদের নিকট অনুমতি চান। জিনরা এতে সম্মত হলে তিনি পাহাড়ের উপর বাতি জ্বালান। সে বাতির আলো পাহাড়ের চারদিকে বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে জিনরা সে এলাকা থেকে পালাতে থাকে। সে পাহাড়টি এখন 'চেরাগীর পাহাড়' নামে খ্যাত, ... সম্ভবত এই সূফী সাধকই সর্বপ্রথম চট্রগ্রাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। দেখুন : গোলাম ছাকলায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৫-১১৭।

[4]. তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর শিষ্য ছিলেন। ১৮২১ সালে তিনি সর্ব প্রথম এদেশে আগমন করেন এবং পশ্চিম বঙ্গ, বাংলাদেশ ও আসাম অঞ্চলে একাধারে আঠার বছর পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করেন। দাওয়াত ও হেদায়াতের কাজে এ-সব এলাকায় তিনি তাঁর জীবনের একান্নটি বছর ব্যয় করেন। ১৮৭৩ সালে রংপুর জেলায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেখুন: মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, "ইসলামী দাওয়াত বিস্তারে ও ধর্মীয় - সামাজিক সংস্কারে আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী এর অবদান", পি.এইচ.ডি থিসিস, (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, অপ্রকাশিত, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭৪ ও ৭৫।

[5]. যদিও মানুষের এ ধারণার অবাস্তবতা প্রকাশিত হয়ে গেছে ২০০৪ সালে শাহ জালালের কবরে বোমা হামলা ও এর ফলে লোক মরার মধ্য দিয়ে কেননা, জনগণের ধারণানুযায়ী যদি শাহ জালালের কোনো কেরামতী থাকতো, তা হলে তাঁর কবরে কোনো বোমা বিস্ফুরিত হতো না। বোমা বিস্ফুরণের পূর্বেই তিনি অদৃশ্য থেকে সন্ত্রাসীদের কোনো অনিষ্ট করে দিতেন।- লেখক

[6].হাবীবুর রহমান, আছুদগানে ঢাকা, উর্দূ ভাষায় রচিত, (ঢাকা: মনজর প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮।

[7] আহমদ বাহজাত, আল্লাহু ফীল আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাহ; (কায়রো: মুআছ ছাসাতুল আহরাম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি/), পৃ. ১৯০-১৯১।

[8]. আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারী নামের এ সূফী সাধক ১৮২৬ সালে চট্রগ্রাম জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কর্ম জীবনে তিনি কিছু দিন যশোর জেলায় বিচারকের পদে সমাসীন ছিলেন। অতঃপর তিনি এ পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং কলিকাতার 'বুআলী' নামক মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এ সময়ে তিনি কাদেরিয়্যাহ তরীকার পীর আবূ শিহামাহ এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে চলে আসেন। এবং চট্রগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজে ব্রতী হন। এক পর্যায়ে তিনি জনগণের মধ্যে 'ফকীর মৌলভী' উপাধিতে ভূষিত হন। এলাকায় তাঁর বিভিন্ন কারামত, তাকওয়া ও পরহেগারী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তিনি ১৯০৬ সালে পরলোক

গমন করেন। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৫-১২৬। সংক্ষিপ্তাকারে

[9]. এ মাজার দু’টি সম্পর্কে উপর্যুক্ত তথ্য প্রদান করেছে অত্র এলাকারই ছাত্র মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। সে আল-হাদীস বিভাগের ১৯৯৩-৯৪ সালের ১ম বর্ষের ছাত্র ছিল। তার স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : তুলতুলী, মৌলভী বাজার, উপজেলা ও পোষ্ট : চান্দিনা, জেলা : কুমিল্লা।

[10]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু‘আরা : ২২৩, ২২৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12575

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন